بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩১ আগস্ট ২০১৮ মোতাবেক ৩১ যহুর ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী ছিলেন হযরত উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)। তার পিতা ছিলেন, আবু ওয়াক্কাস মালিক বিন উহায়েব। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত উমায়ের (রা.) হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)'র ছোট ভাই ছিলেন এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের একজন ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল হামনা বিনতে সুফিয়ান। তিনি কুরাইশের বনু যাহরা গোত্রের সদস্য ছিলেন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন আর সেখানেই তার শাহাদত হয়। মহানবী (সা.) হযরত উমায়ের (রা.) এবং হযরত আমর বিন মুয়ায (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। **{আল্ ইস্তিআব, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪, উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত}**, **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৯, উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** কারো কারো মতে, মহানবী (সা.) হযরত উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত খুবায়েব বিন আদী'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। **{উয়ুনুল আসার, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩২, বাব যিকরুল্ মওয়াখাতে, বৈরুতের দ্বারুল্ কলম থেকে ১৯৯৩ সালে মুদ্রিত}**

তার (রা.) শাহাদতের ঘটনা এবং বদরের যুদ্ধে তার (রা.) যোগদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এভাবে লিখেছেন যে, মদীনা থেকে কিছুটা দূরত্বে গিয়ে মহানবী (সা.) শিবির স্থাপন করার নির্দেশ দেন আর সেনাদলের সমীক্ষণ করেন। মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী হবার আকাঙ্ক্ষায় যেসব স্বল্প বয়স্ক বালক চলে এসেছিল, তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ছোট ভাই উমায়েরও স্বল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি যখন (স্বল্প বয়স্ক) বালকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ শুনতে পান তখন সৈন্যহিনীর মাঝে আত্মগোপন করেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তার পালা আসে আর মহানবী (সা.) তাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশ শুনে হযরত উমায়ের কাঁদতে শুরু করেন। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর অসাধারণ আগ্রহ দেখে তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ৩৫৩}**

ইতিহাসের আরেকটি গ্রন্থে এভাবে তার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আমর বিন সা'দ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বদর অভিমুখে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে সরেজমিনে আমাদের অবস্থা পরিদর্শনের পূর্বে আমি আমার ভাই উমায়ের বিন ওয়াক্কাসকে দেখি যে, সে এদিক সেদিক পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, হে (আমার) ভাই! তোমার কি হয়েছে? তিনি বলেন, আমার আশঙ্কা হয়, পাছে মহানবী (সা.) আমাকে দেখলে (কম বয়স্ক) বালক মনে করে আবার ফেরত না পাঠিয়ে দেন। আমি যুদ্ধের জন্য যেতে চাই, হয়তো আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শাহাদতের সৌভাগ্য দেবেন। অতএব মহানবী

(সা.)-এর সামনে যখন তাকে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি (সা.) তাকে ছোট মনে করে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, তখন উমায়ের কাঁদতে আরম্ভ করেন। এরপর মহানবী (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৯, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** তার তরবারীটি বড় ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাতে তার তরবারীর খাপ বাঁধেন। **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০৩, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)** হযরত উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস বদরের যুদ্ধে যখন শাহাদত বরণ করেন তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৯, উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** ১৬ বছর বয়সেও তার উচ্চতা সম্ভবত কম ছিল আর মহানবী (সা.) সাধারণত ছোটদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন নি।

দ্বিতীয় সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে, তিনি হলেন হযরত কুতবাহ্ বিন আমের (রা.)। তিনি আনসারী ছিলেন এবং আমের বিন হাদীদার পুত্র ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মায়ের নাম হলো যয়নব বিনতে আমর। তার স্ত্রীর নাম হযরত উম্মে আমর, যার এক কন্যা হলেন হযরত উম্মে জামীল। আকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় বয়আত তথা উভয় (বয়আতেই) তিনি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি সেই ছয়জন আনসারী সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা মক্কায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছেন। তার পূর্বে আনসারের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হয় নি। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪, কুতবাহ্ বিন আমের (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}**

তার ইসলামগ্রহণের ঘটনা সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, নবুওয়তের একাদশতম বছরের রজব মাসে মক্কায় মহানবী (সা.)-এর সাথে ইয়াসরেব তথা মদীনাবাসীদের আবার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তিনি (সা.) তাদের বংশ পরিচয় জানতে চাইলে জানা যায় তারা খাযরাজ গোত্রের সদস্য আর মদীনা থেকে এসেছে। মহানবী (সা.) পরম স্নেহ ও ভালোবাসার সুরে বলেন, আপনারা কি আমার কিছু কথা শুনবেন? তারা বলেন, জ্বি; আপনি কি বলতে চান বলুন। তিনি (সা.) বসে পড়েন আর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এরপর পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত শুনিয়ে নিজের মিশন (বা পবিত্র উদ্দেশ্য) সম্পর্কে অবহিত করেন। (তখন) তারা পরস্পরের প্রতি তাকায় এবং বলে, এটিই সুযোগ, কোথাও ইহুদীরা আবার আমাদের চেয়ে (এক্ষেত্রে) এগিয়ে না যায় আর একথা বলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা ছিলেন ৬জন, যাদের নাম হলো, আবু উমামাহ্ আসাদ বিন যুরারাহ্, তিনি বনু নাজ্জারের সদস্য ছিলেন আর সত্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ছিলেন। অওফ বিন হারেস, তিনিও বনু নাজ্জারের সদস্য ছিলেন, যা ছিল মহানবী (সা.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের নানার গোত্র। রাফে' বিন মালেক ছিলেন বনু যুরায়েকের সদস্য। সেসময় পর্যন্ত কুরআনের যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল মহানবী (সা.) তখন তাকে তা দান করেন। বনী সালামা গোত্রের কুতবাহ্ বিন আমের, বনী হারাম গোত্রের উকবাহ্ বিন আমের আর বনী উবায়েদ গোত্রের সদস্য ছিলেন জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রেয়াব। এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে বিদায় নেন আর যাবার বেলায় অনুরোধ করেন যে, গৃহযুদ্ধ আমাদেরকে খুবই দুর্বল করে দিয়েছে আর আমাদের মাঝে পরস্পর অনেক অনৈক্য রয়েছে। আমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের ভাইদের মাঝে ইসলাম প্রচার করব। হতে পারে আপনার

মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুনরায় ঐকবদ্ধ করে দিবেন। এরপর আমরা আপনাকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত থাকবো। অতএব তারা ফিরে যায় আর এভাবে তাদের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামের চর্চা আরম্ভ হয়। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ. রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন, পৃঃ ২২১-২২২}** (ইসলাম সম্পর্কে মানুষ) বলে যে, ইসলাম এসে বিভেদ সৃষ্টি করেছে! অথচ ইসলামের কল্যাণে পারস্পরিক বিভেদ এবং নৈরাজ্য দূরীভুত হওয়ার (সম্ভাবনার) কথাই এই লোকেরা বলেন আর বাস্তবে তা-ই হয়েছে। যারা পরস্পরের শত্রু ছিল তারা ভাই ভাই হয়ে যায়। পূর্বের এক খুতবাতেও আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, তাদের পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাওয়া শত্রুর চোখে শূল হিসেবে বিধতো, যে কারণে তারা আবার বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে কিন্তু মহানবী (সা.)-এর বুঝানোর কারণে আর তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির কল্যাণে পুনরায় ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দক্ষ তীরন্দাজদের একজন ছিলেন হযরত কুতবা (রা.)। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক (পরিখা) এবং অন্যসব যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। সেদিন তার দেহে নয়টি আঘাত লাগে। মক্কা বিজয়ের সময় বনু সালামার পতাকা তার হাতেই ছিল। বদরের যুদ্ধে হযরত কুতবাহ্'র অবিচলতার চিত্র হলো, তিনি দু'টো সারির মাঝে একটি পাথর রেখে বলেন, আমি ততক্ষণ এই ময়দান ছেড়ে পালাব না যতক্ষণ পর্যন্ত এ পাথর রণক্ষেত্র থেকে পালাবে। অর্থাৎ শর্ত আরোপ করেন যে, আমার প্রাণ গেলেও রণক্ষেত্র ছেড়ে আমি যাচ্ছি না।

ইয়াযীদ বিন আমের ছিলেন তার ভাই, যিনি সত্তরজন আনসারীর সাথে আকাবার বয়আতে যোগদান করেছিলেন। হযরত ইয়াযীদ বদর এবং উহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেন আর মদীনা এবং বাগদাদেও তার সন্তান-সন্ততি ছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪, কুতবাহ্ বিন আমের (রা.) ওয়া আখুহু ইয়াযীদ বিন আমের (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** হযরত আবু হাতেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত কুতবাহ্ বিন আমের (রা.) হযরত ওমর (রা.)'র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। আর ইবনে হিব্বানের মতে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)**

তৃতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, ওয়াহাব বিন রবীয়া'র পুত্র হযরত শুজা' বিন ওয়াহাব (রা.)। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাকে শুজা' বিন আবী ওয়াহাবও বলা হয়। তার পরিবার বা বংশ বনু আব্দে শামসের মিত্র ছিল। তিনি দীর্ঘকায় এবং শীর্ণদেহ ও খুব ঘন চুলের অধিকারী ছিলেন। হযরত শুজা' সেসব পুণ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যারা শুরুর দিকেই মহানবী (সা.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তির ছয় বছর পর হুযূর (সা.)-এর নির্দেশে ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় যোগ দিয়ে (তিনি) ইথিওপিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পর গুজব শোনেন যে, মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে, এটি শুনে হযরত শুজা' (রা.) ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলে তিনি তার ভাই উকবাহ্ বিন ওয়াহাবের সাথে মক্কার ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনায় চলে যান। হুযূর (সা.) হযরত অওস বিন খওলীকে হযরত শুজা'র ধর্মীয় ভাই বানিয়েছিলেন।

অর্থাৎ যে ভাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন (তাকে) হযরত শুজা'র ভাই বানিয়েছিলেন। হযরত শুজা' (রা.) বদর, উহুদ এবং খন্দক (পরিখা) সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। ৪০ বছরের কিছু অধিক আয়ুষ্কাল লাভ করে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। **(উসদুল গাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭০, শুজা' বিন ওয়াহাব, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে মুদ্রিত), {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫১, শুজা' বিন ওয়াহাব (রা.), বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)**

হুদায়বিয়ার সন্ধি করে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.) পৃথিবীর অধিকাংশ বাদশাহ্কে ইসলামের আমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদিন খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়ান। আল্লাহ্র প্রশংসা এবং গুণকীর্তনের পর তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাদের কতককে অনারব বাদশাহ্দের কাছে প্রেরণ করতে চাই। (অর্থাৎ অনারব বাদশাহ্দের কাছে পাঠাতে চাই।) তোমরা আমার সাথে মতভেদ করবে না, যেভাবে ইসরাইলীরা ঈসার সাথে করেছিল। তখন মুহাজিররা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা কখনো আপনার সাথে কোনো বিষয়ে মতভেদ করব না, আপনি আমাদেরকে প্রেরণ করুন। **(সীরাত ইবনে কাসীর, পৃঃ ৪২১, বাবু যিকরে বা'সিহি ইলা কিসরা মুলকিল ফারেস, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ২০০৫ সনে মুদ্রিত)** অতএব যেসব সাহাবী এই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন তাদের মাঝে হযরত শুজা' বিন ওয়াহাবও ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত শুজা'কে হারেস বিন আবী শিমার গাস্সানীর কাছে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন, যে দামেস্কের নিকটস্থ গোতা নামক স্থানের রইস বা গভর্নর ছিল। অনেকের মতে তার নাম ছিল মুনযির বিন হারেস বিন আবী শিমার গাস্সানী। যাহোক, তিনি যে তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন, তার প্রারম্ভিক বাক্য এমন ছিল,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (صلى الله عليه وسلم) اِلَى الْحَارِثِ ابْنِ اَبِيْ شِمْر۔ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَصَدَّقَ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ يَبْقٰى لَكَ مُلْكُكَ۔

(শরাহ্ যুরকানী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬, ওয়া আম্মা মুকাতাবাতুহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইলাল মালাকূকে ওয়া গায়রিহিম, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত), {আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৬, শুজা' বিন ওয়াহাব, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে মুদ্রিত} **'মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হারেস বিন আবী শিমারের প্রতি। তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যে হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে এবং সত্যায়ন করে। নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সেই খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আর এভাবেই তোমার রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করবে'।**

হযরত শুজা' বলেন, আমি পত্র নিয়ে যাত্রা করি আর হারেস বিন আবী শিমারের প্রাসাদের ফটকে পৌঁছার পর সেখানে দুইতিন দিন কেটে যায় কিন্তু দরবারে প্রবেশ করতে পারি নি। অবশেষে সেখানকার প্রধান নিরাপত্তারক্ষীকে বলি, আমি তার কাছে মহানবী (সা.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। তখন সেই নিরাপত্তা প্রধান বলেন, গভর্নর উমুক দিন বাইরে আসবেন, এর পূর্বে কোনোভাবেই তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। (হযরত) শুজা' বলেন, সেই নিরাপত্তারক্ষীই তখন আমাকে মহানবী (সা.) এবং তাঁর তবলীগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে থাকেন। আমি তাকে বিস্তারিত বিবরণ দিলে তার হৃদয়ে তা গভীর প্রভাব

ফেলে এবং সে কাঁদতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ সেই অঞ্চলের বাদশাহ্ বা গভর্নর যা-ই বলুন তার প্রধান নিরাপত্তারক্ষী। এরপর সে বলে, আমি ইঞ্জিলে পড়েছি, এই নবীর বিস্তারিত বিবরণ তাতে হুবহু এভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। অথচ আমি ভাবতাম, তিনি সিরিয়াতে আবির্ভূত হবেন কিন্তু এখন জানলাম, তিনি কারিযের ভূখণ্ড অর্থাৎ ইয়ামেন অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছেন। যাহোক, আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি। সেই নিরাপত্তা প্রধান বলেন, আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং তাঁর সত্যায়ন করছি। হারেস বিন আবী শিমারকে আমার ভয় লাগে, হয়ত সে আমাকে হত্যা করবে। একইসাথে সে এই শঙ্কাও প্রকাশ করে যে, অত্র অঞ্চলের গভর্নর আমাকে হত্যা করবে। তিনি (রা.) বলেন, এরপর থেকে সেই নিরাপত্তারক্ষী আমাকে অনেক সম্মান করতে আরম্ভ করে এবং অতি উত্তমরূপে আমার আতিথেয়তা করে। (এছাড়া) হারেস সম্পর্কেও সে আমাকে বিভিন্ন বিষয় অবহিত করতে থাকে এবং তার সম্পর্কে সে হতাশা ব্যক্ত করত। সে বলে, হারেস বিন আবী শিমার মূলত রোমের বাদশাহ্ কায়সারকে ভয় করে, কেননা সে তারই রাজত্বের অধীনে ছিল। অবশেষে একদিন হারেস বাইরে আসে আর দরবারে এসে আসন গ্রহণ করে, তার মাথায় মুকুট ছিল। অতঃপর আমি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাই। তার সামনে গিয়ে আমি মহানবী (সা.)-এর পত্র তার কাছে হস্তান্তর করি। সেই পত্রটি পড়ার পর সে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং ক্রোধান্বিত হয়ে বলতে থাকে, কে আছে যে আমার কাছ থেকে আমার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে? সে ইয়ামেনে থাকলেও আমি নিজে তার বিরুদ্ধে অগ্রাভিযান পরিচালনা করব। আমি সেখানে তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য পৌঁছে যাব। মানুষ (যেন) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সে তার ব্যবস্থাপনাকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে (সে) একথা বলে যে, আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হবো আর {মহানবী (সা.)} যে পত্র লিখেছেন তাতে (তাকে) সতর্ক করে বলেছেন, তুমি বিরত না হলে তোমার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। যাহোক, বলেন যে, এরপর হারেস বিন আবী শিমার রাত পর্যন্ত দরবারেই বসে থাকে আর মানুষ তার কাছে আসতে থাকে। এরপর সে অশ্বারোহীদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং আমাকে বলে, তোমার মনিবকে এখানকার পুরো অবস্থা বলে দিও। এরপর সে রোমান সম্রাট কায়সারকে মহানবী (সা.)-এর পত্র–সংক্রান্ত পুরো ঘটনা লিখে পাঠায়। নিজের দূত প্রেরণ করে এবং এসব কথাই লিখে পাঠায় যে, এভাবে এই প্রতিনিধি আমাকে ইসলামের তবলীগ করার জন্য এসেছে। হারেস বিন আবী শিমারের এই পত্রটি কায়সারের কাছে পৌঁছার পূর্বেই হযরত দেহিয়া কালবীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি পত্র কায়সারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। হারেসের পত্র পাঠের পর কায়সার তাকে উত্তরে লিখেন, এই নবীর ওপর আক্রমন এবং পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা পরিহার করো এবং তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যাহোক, কায়সারের উত্তরপত্র হারেসের কাছে পৌঁছার পর সে হযরত শুজা'কে ডেকে নিয়ে আসে, কেননা তখনো তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সে বলে, তুমি কখন ফিরে যেতে চাও? হযরত শুজা' বলেন, আগামীকাল। তখনই বাদশাহ্ তাকে একশ' স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দেয়। তখন সেই প্রহরী তার কাছে আসেন, পূর্বে যিনি প্রধান নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন তিনি তার কাছে আসেন এবং নিজেও কিছু টাকা ও কাপড় দেন। এরপর সেই নিরাপত্তা প্রধান বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে আমার সালাম পৌঁছাবেন আর বলবেন, আমি তাঁর ধর্মের অনুসারী হয়ে গেছি। হযরত শুজা' বলেন, মহানবী (সা.)-এর সকাশে ফিরে আসার পর আমি তাঁকে (সা.) বাদশাহ্ হারিস

সম্পর্কে সবকিছু অবগত করি। পুরো ঘটনা শুনে তিনি (সা.) বলেন, ধ্বংস হয়ে গেছে অর্থাৎ তার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর আমি মহানবী (সা.)-কে তার প্রাসাদের প্রধান প্রহরীর সালাম পৌঁছে দেই এবং সে যা কিছু বলেছিল তার সবই তাঁকে বলি। তখন তিনি (সা.) বলেন, সে সত্য বলেছে। এই পুরো ঘটনা সীরাতুল হালবিয়াতে বর্ণিত হয়েছে। **{আস্ সীরাতুল্ হালবিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮, বাব যিকরু কিতাবিহি (সা.) ইলাল হারেস ইবনে আবী শিমার, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ হতে ২০০২ সালে মুদ্রিত}**

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থের যা কিছু বর্ণনা করেছেন তাতে অতিরিক্ত যে কথাগুলো আলে তা হলো, তিনি লিখেন, পঞ্চম তবলিগী পত্রটি গাস্সান রাজ্যের বাদশাহ্ হারেস বিন আবী শিমারের নামে লেখা হয়। গাস্সানের রাজত্ব আরব সীমান্তের সাথে যুক্ত উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল আর সেখানকার গভর্নর কায়সার বা রোমান সম্রাটের অধীনস্থ ছিল। হযরত শুজা' বিন ওয়াহাব (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন তখন হারেস রোমান সম্রাটের বিজয় উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। (রোমান সম্রাটের বিজয় উৎসব ছিল, এজন্য সেখানকার গভর্নর প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল।) হারেসের সাথে সাক্ষাতের পর্বে শুজা' বিন ওয়াহাব তার প্রহরী অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিষয়ক ব্যবস্থাপকের সাথে দেখা করেন, তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। হযরত শুজা'র মুখে মহানবী (সা.)-এর কথা শোনার পর তিনি সর্বতোরূপে তাঁর সত্যায়ন করেন। যাহোক, কয়েক দিন অপেক্ষার পর সেই ঘটনাই (ঘটে যা) বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত শুজা' বিন ওয়াহাব (রা.) গাস্সানের বাদশাহ্র দরবারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর পত্র উপস্থাপন করেন। পত্র পাঠের পর হারেস রাগান্বিত হয়ে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর শুধু ক্রোধের সাথে ছুড়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয় নি বরং যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, (সে) সৈন্যদেরকে আক্রমন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয় এবং এরই ফাঁকে সে কায়সারের নিকটেও এই পত্রটি প্রেরণ করে আর বলে যে, (তাঁর বিরুদ্ধে) আমি অভিযান পরিচালনা করতে যাচ্ছি। তখন (রোমান সম্রাট) কায়সার বলেন, অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন নেই বরং দরবারে অংশ গ্রহণের জন্য এলিয়া বা বায়তুল মুকাদ্দসে এসে আমার সাথে দেখা করো। (রোমান সম্রাট কায়সার সেই বাদশাহ্কে ডেকে পাঠান।) যাহোক, এখানেই এ বিষয়ের অবসান ঘটে। হাদীস ও ইতিহাস থেকে জানা যায়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনায় এই ভীতি বিরাজমান ছিল যে, গাস্সানী গোত্রগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় আক্রমন করতে পারে। **{হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৮২৮-৮২৯}** এই ভীতি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। সেই উত্তরের কারণে যা শিমার মহানবী (সা.)-এর সাহাবীকে দিয়েছিল।

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী (সা.) সংবাদ পান, বনু হাওয়াযেন গোত্রের একটি শাখা বনু আমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মহানবী (সা.) হযরত শুজা'কে ২৪জন যোদ্ধা সহ তাদেরকে দমনের জন্য নিযুক্ত করেন, যারা মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন বনু আমেরের যোদ্ধারা মদীনা হতে পাঁচ রাতের সফরের দূরত্বে **আস্সিয়্যু** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল যা মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থিত। তিনি অর্থাৎ হযরত শুজা' যোদ্ধাদের সাথে রাতের বেলা সফর করতেন এবং দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে হঠাৎ এক প্রভাতে বনু আমেরের (যোদ্ধাদের)

সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। মুসলমানদেরকে তারা অকস্মাৎ নিজেদের সামনে দেখে ভয় পেয়ে যায়। যদিও তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়েছিল এবং পুরো সেনাদল নিয়ে এসেছিল তথাপি তারা সবকিছু ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যায়। হযরত শুজা' (রা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করার জন্য তার সহযোদ্ধাদের নির্দেশ দেন। তাদের পিছু ধাওয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই আর মালে গণিমত, সেই যুগের রীতি অনুসারে তারা উট ও মেষপালের যা কিছু ফেলে গিয়েছিল তা তারা হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। প্রত্যেক যোদ্ধা ১৫টি করে উট পেয়েছিলেন এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম এর বাহিরে ছিল, এ থেকে বুঝায় মালে গণিমত কত বেশি ছিল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১৩, সারিয়া শুজা' বিন ওয়াহাব (রা.) ইলা বনি আমের বেআস্‌সিয়্যি, বৈরুতের দ্বার এহ্‌ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত}** অর্থাৎ আক্রমণের জন্য যারা এসেছিল তারা পুরো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল আর যুদ্ধের সকল সাজসরঞ্জামে তারা সজ্জিত ছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.)। পূর্বের একটি খুতবাতেও সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা হয়েছে। তার পিতা ছিলেন উসমান বিন শারীদ। তৃতীয় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধে তার ইন্তেকাল হয়। তার (আসল) নাম হলো উসমান এবং উপাধি ছিল শাম্মাস, আর এই উপাধিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি বনু মাখযুম গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলমান হয়েছিলেন। **{উসদুল গাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪, শামাস বিন উসমান (রা.), বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}** ইবনে হিশাম হযরত শাম্মাস বিন উসমানের নাম শাম্মাস হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, শাম্মাস (রা.)'র নাম হলো উসমান। শাম্মাস আখ্যায়ীত হওয়ার কারণ হলো খ্রিষ্টানদের এক ধর্মীয় নেতাকে শাম্মাস বলা হতো, অজ্ঞতার যুগে সে মক্কায় আসে, সেই খ্রিষ্টান নেতা খুবই সুদর্শন ছিল। তার সৌন্দর্য দেখে মক্কার মানুষ বিস্মিত হয়। উতবাহ্ বিন রবীয়্যা ছিল উসমানের মামা। সে বলে, আমি তোমাদেরকে শাম্মাসের চেয়ে বেশি সুন্দর একটি ছেলেকে দেখাচ্ছি আর এরপর সে তার ভাগ্নে হযরত উসমানকে এনে দেখায়। তখন থেকে উসমানকে মানুষ শাম্মাস বলতে আরম্ভ করে। হযরত শাম্মাসের নাম শাম্মাস হওয়ার আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হয় আর তা হলো তার চেহারার রক্তিম আভা ও শুভ্রতা ছিল, এজন্য তার নাম শাম্মাস অর্থাৎ তিনি যেন সূর্যের মত। অতএব এ কারণেই শাম্মাস নামটি তার আসল নামের ওপর প্রাধান্য পেয়ে যায়। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৬২, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সনে মুদ্রিত) (আল্ মুন্তাযেম ফি তারীখিল মুলুকে ওয়াল উমুম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮৭, আল্ মকতুবাতুশ্ শামেলা)**

হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) এবং তার মা হযরত সফিয়া বিনতে রবীয়্যা বিন আব্দে শামস ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত শাম্মাসের মা শায়েবা এবং উতবাহ্‌র (বদরের যুদ্ধে নিহত মক্কার দুই নেতার) বোন ছিলেন। হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসার পর মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) মদীনায় হিজরতের পর হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দে মুনযেরের বাড়িতে অবস্থান করেন। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বলেন, হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত মুবাশ্বের বিন আব্দিল মুনযেরের বাড়িতেই অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত শাম্মাস বিন উসমান এবং হযরত হাঞ্জালা বিন আবী আমের

(রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করে দেন। হযরত শাম্মাস (রা.)'র ছেলের নাম ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্ আর তার স্ত্রী ছিলেন উম্মে হাবীব বিনতে সাঈদ। তিনি প্রাথমিক যুগে হিজরতকারী মুসলিম নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(উসদুল গাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪, বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}, {সিয়ারুস্ সাহাবা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২৪, শাম্মাস বিন উসমান (রা.), করাচীর দ্বারুল এশায়াত এথকে মুদ্রিত}, (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)**

হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি প্রাণপণ লড়াই করেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি শাম্মাস বিন উসমানকে ঢাল সদৃশ্য পেয়েছি। মহানবী (সা.) ডান, বাম যেদিকেই তাকাচ্ছিলেন সেদিকেই হযরত শাম্মাসকে দেখছিলেন, উহুদের যুদ্ধে তিনি তার তরবারির মাধ্যমে প্রতিরোধ করছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমন হলে পাথরের আঘাতে তিনি (সা.) অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত শাম্মাস নিজেকে মহানবী (সা.)-এর সামনে ঢাল হিসেবে দাঁড় করে রেখেছিলেন, যার ফলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং আহত অবস্থায় তাকে তুলে মদীনায় নিয়ে আসা হয়। তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। প্রথমে তাকে হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.) বলেন, আমার বাদ দিয়ে আমার চাচাত ভাইকে কি অন্য কারো ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে? (তখন) মহানবী (সা.) বলেন, তাকে হযরত উম্মে সালামাহ্র কাছেই নিয়ে যাও। তারপর তাকে সেখানেই নিয়ে যাওয়া হয় আর তার বাড়িতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। উহুদের যুদ্ধে গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানে গিয়েছিলেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত শাম্মাস (রা.)-কে উহুদ প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে পরিহিত পোশাকেই তাকে সমাহিত করা হয়। যুদ্ধের পর যখন আহত অবস্থায় তাকে মদীনায় নিয়ে আসা হয় তখন সেখানে তিনি একদিন এক রাত জীবিত ছিলেন আর বলা হয়ে থাকে যে, একান্ত দুর্বলতা আর অচেতন থাকার কারণে তিনি এসময় কিছু পানাহার করেন নি। ৩৪ বছর বয়সে হযরত শাম্মাস (রা.) ইন্তেকাল করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩১, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)**

আরেক সাহাবী হলেন হযরত আবু আব্স বিন জাবর (রা.)। তার পিতার নাম ছিল জাবর বিন আমর। ৩৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার আসল নাম ছিল আব্দুর রহমান আর ডাক নাম ছিল আবু আব্স। তিনি আনসারের বনু হারসা গোত্রের সদস্য ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে তার নাম ছিল আব্দুল উয্যা। মহানবী (সা.) এই (নাম) পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখেছিলেন। উয্যা ছিল তাদের (এক) প্রতিমার নাম, তাই এটি পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখে দেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি বদরসহ সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। ইহুদী কা'ব বিন আশরাফকে যেসব সাহাবী হত্যা করেছিলেন, তিনিও তাদের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু আব্স এবং হযরত খুনায়েস (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। ৩৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মক্কায় তার সন্তান-সন্ততিদের অনেকেই বসবাস করত। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়। **(উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪-২০৫, বৈরুতের দ্বারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}, (আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২২২, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)** হযরত আবু আব্স বিন জাবর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত

হয়েছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও তিনি আরবী লিখতে জানতেন। অথচ সে যুগে আরবে লেখার প্রচলন খুবই কম ছিল। হযরত আবু আব্‌স এবং হযরত আবু বুরাদাহ্ বিন নায়ার যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তারা উভয়েই বনু হারেসার প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। হযরত উমর এবং হযরত উসমান (রা.) তাদেরকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠাতেন অর্থাৎ তারা অর্থ বিভাগের দায়িত্বেও ছিলেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)** মহানবীর যুগে হযরত আবু আব্‌স এর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাকে একটি লাঠি দিতে গিয়ে বলেন, এর সাহায্যে আলো নাও। সত্যিকার অর্থেই সেই লাঠি তার সামনের পথকে আলোকিত করতো। **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২২২, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)** এর একটি অর্থ এটি হতে পারে যে, এই লাঠি তোমার হাতে থাকবে, যেভাবে অন্ধ মানুষ ((হাঁটার সময়) লাঠি ব্যবহার করে, এটি সেভাবে কাজে আসবে কিন্তু একটি অর্থ এটিও হতে পারে যে, হয়তো এটি থেকে আলো বের হতো। অনেক সময় রাতের বেলা হয়তো তিনি কম দেখতে পেতেন তখন (লাঠি থেকে) হয়তো আলো বের হতো। কেননা, আরো কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কেও এই রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, অনেক সময় তারা অন্ধকারে সফর করতেন আর তাদের লাঠি থেকে আলো বের হতো। {**মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৯৩, হাদীস নংঃ ১৩৯০৬, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণিত, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে মুদ্রিত**} বরং এমনও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিনজন সাহাবী রাতের বেলা সফর করছিলেন আর অন্ধকার রাত ছিল, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা একইভাবে এই দৃশ্য দেখিয়েছেন যে, আলো তাদের সামনে সামনে চলতে তাকে। **(সংগৃহীত)**

হযরত আবু আব্‌স এর এক ছেলে (একটি) ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু আব্‌স মহানবী (সা.)-এর পিছনে নামায পড়তেন এরপর নিজের গোত্র বনু হারেসার উদ্দেশ্যে চলে যেতেন। একবার এক অন্ধকার রাতে যখন বৃষ্টিও হচ্ছিল তখন তিনি তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন তখন তার লাঠি থেকে আলো বের হতে আরম্ভ হয়, যা তার জন্য রাস্তাকে আলোকিত হয়ে দেয়। **(আল্ মুস্তাদরেক আলাস সহীহাঈন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০২৮, হাদীস নংঃ ৫৪৯৫, নায্‌যারুল মুসতাফা আল্‌বায ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত)**

হযরত উসমান (রা.) তার অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে যান, তখন তিনি অচেতন অবস্থায় ছিলেন, জ্ঞান ফিরলে হযরত উসমান (রা.) তাকে বলেন, আপনি কেমন বোধ করছেন? তিনি বলেন, আমি ভালো আছি কিন্তু উট বাঁধার একটি রশি সম্পর্কে আমি (চিন্তিত), যা ভুলবশত আমার এবং কর্মচারীদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পর্যন্ত আমি সেই চিন্তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারছি না। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)** যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, তিনি একজন যাকাত বা কর সংগ্রাহক ছিলেন আর এ কাজে তাকে বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হতো। দায়িত্ববোধ এবং বিশ্বস্ততার মান দেখুন! একটি উট বাঁধার রশি ভুলবশতঃ হারিয়ে গিয়েছিল আর সে কারণে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি চিন্তিত ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় মনে পড়ে যে, এই রশি পাছে আবার কোথাও পরকালে আমাদের পরীক্ষার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। অতএব এরাই সেই

মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী যারা আল্লাহ্ তা'লার ভয় এবং বিশ্বস্ততার এমন মানে উপনীত ছিলেন।

হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি আসরের নামায আর কেউ পড়তো না অর্থাৎ সময়ের নিরিখে। আসরের প্রথম সময়েই তিনি আসরের নামায পড়তেন। আনসারের দু'ব্যক্তি এমন ছিলেন যাদের বাড়ি ছিল মসজিদে নববী থেকে সবচেয়ে দূরে। একজন ছিলেন হযরত আবু লুবাবা বিন আব্দুল মুনযির, যিনি বনু অওফের সদস্য ছিলেন আর দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত আবু আবস বিন জবর, যিনি বনু হারেসার সদস্য ছিলেন। আবু লুবাবার বাড়ি ছিল কুবায় আর হযরত আবু আবসের বাড়ি ছিল বনু হারেসায়। উভয় সাহাবী অনেক দূরে অর্থাৎ দুই আড়াই মাইল দূরে থাকতেন, তারা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়তেন আর নিজেদের পাড়ায় যখন ফিরে যেতেন তখনও তাদের পাড়ায় আসরের নামায পড়া হত না। **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০৭, হাদীস নং ১২৫১৬, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে মুদ্রিত)** এই ছিল তাদের দ্রুত হাঁটার প্রমাণ, এছাড়া এতটা পথ পাড়ি দিয়ে তারা মহানবী (সা.)-এর পিছনে নামায পড়ার জন্য আসতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবসের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে ব্যক্তি খোদার পথে নিজের পা ধূলোমলিন করে, খোদা তার জন্য আগুন হারাম করে দেবেন।** **(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯, হাদীস নং ১৬০৩১, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে মুদ্রিত)** অর্থাৎ খোদার পথে জিহাদকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে জীবনযাপনকারী, (খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে) নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেয়া লোকজন এতে অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে তবলীগের উদ্দেশ্যে যারা সফর করে আর তারাও যারা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাজামাত নামায পড়তে মসজিদে আসে, এরা সবাই এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, **তাদের জন্য আগুন হারাম করে দেয়া হয়েছে।**

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু আকীল বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রা.)। তার পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সা'য়লাবাহ্। দ্বাদশ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার নাম ছিল আব্দুর রহমান ইরাশী বিন আব্দুল্লাহ্। তার প্রাক্তন নাম হলো, আব্দুল উয্যা। ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) তার নাম রাখেন আব্দুর রহমান। তিনি বাল্লী গোত্রের শাখা বনু উনায়েফের সদস্য ছিলেন। তিনি আনসারের বনু জাহ্জাবা বিন কুলফাহ্'র মিত্র ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু আকীল আর এই নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। (তিনি) বদর, উহুদ, পরীখা সহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। দ্বাদশ হিজরীতে আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮-২৪৯, বৈরুতের দ্বার এহ্ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত)** তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পর একদিন এক যুবক মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। (এরপর) ঈমান আনার পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং প্রতিমার প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কি? তিনি বলেন, আমার নাম আব্দুল উয্যা। (এতে) মহানবী (সা.) বলেন, না, বরং আজ থেকে তোমার নাম হবে আব্দুর রহমান। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ তিনি শিরোধার্য করেন আর সবাইকে বলে দেন যে, এখন থেকে আমি আব্দুল

উয্যা নই বরং আব্দুর রহমান। তার পিতৃপুরুষের একজন ছিলেন ইরাশাহ্ বিন আমের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ইরাশীও বলা হয়। **(তালেব হাশমী রচিত আসমানে হিদায়াত কে সত্তর সিতারে, পৃঃ ৪৯১-৪৯২, লাহোরো উর্দূ বাজারস্থ আল্ বদর প্রকাশনা থেকে মুদ্রিত)** তিনি সেসব সন্মানিত সাহাবীর একজন ছিলেন, মহানবী (সা.) যখন আর্থিক কুরবানীর নির্দেশ দিতেন তখন তাঁরা সারারাত কাজ করে যা কিছু আয় করতেন তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দিতেন। অতএব, বুখারীতে তার সম্পর্কে এসেছে যে, হযরত আবু মাসঊদ বর্ণনা করেন, আমাদেরকে যখন সদকা-খয়রাত বা আর্থিক কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয় তখন আমরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বোঝা বহন করতাম। হযরত আবু আকীল পারিশ্রমিকের অর্থ দিয়ে আধা সা' খেজুর নিয়ে আসেন। আরেকজন তার চেয়ে বেশি আনেন। তখন মুনাফিকরা বলতে আরম্ভ করে, আল্লাহ্ এ ব্যক্তির সদকা বা খয়রাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন আর দ্বিতীয়জন যে সদকা করেছে তা কেবল লোক দেখানোর জন্য। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে,

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ* **(সূরা আত্ তাওবা: ৭৯)**

অর্থাৎ মু'মিনদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় পুণ্য সম্পাদনকারীদের দান-খয়রাত সম্পর্কে যারা অপবাদ দেয় এবং (তাদেরও) যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই (দেয়ার মতো) পায় না; আর তারা তাদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ঠাট্টাবিদ্রূপের শাস্তি দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, বাব আল্লাযীনা ইয়ালমিযূনাল্ মুতাওয়্যেঈনা... ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, হাদীস নং: ৪৬৬৮, রাবওয়ার নাযারাতে এশাআত কর্তৃক মুদ্রিত)**

আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের (মাঝে) অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী রয়েছে। তাদের প্রচেষ্টা কত অদ্ভুত ছিল আর তাদেরই আদর্শকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে খোদা তা'লা পরবর্তী প্রজন্মকেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন।

এই ঘটনার বিশদ বিবরণ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এভাবে বর্ণনা করেন, তাকে অর্থাৎ হযরত আবু আকীলকে সাহেবুস্ সা'ও বলা হয়। ঘটনার বিবরণ কিছুটা এমন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে আসেন। আনসারদের দরিদ্র মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবু আকীল এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দুই সা' খেজুরের বিনিময়ে সারা রাত আমি কূপ থেকে পানির বালতি তুলতে থাকি, এর এক সা' আমি বাড়ির লোকদের জন্য রেখেছি আর দ্বিতীয় সা' আপনার সামনে উপস্থাপন করছি। কোনো কোনে রেওয়ায়েতে এক সা' থেকে অর্ধেক সা' দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ অর্ধেক দিয়ে দিলাম আর অর্ধেক আমি বাড়িতে রেখে এসেছি। মুনাফিকরা তখন বলে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) আবু আকীলের সা'র মুখাপেক্ষী নন। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন **الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ** **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)** অর্থাৎ এরা মুনাফিক, এরা মু'মিনদের মাঝে যারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক কুরবানী করে তাদেরকে হাসিঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে, আর তাদেরকেও যারা নিজদের পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কিছু (খরচ) করার সামর্থ্য রাখে না।

তিনিই সেই আনসারী সাহাবী ছিলেন, যিনি মুসায়লামা কাযযাবের ওপর শেষ আক্রমন করেছিলেন। কাজেই, ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত আবু আকীল উনাইফি আহত হন, তার কাঁধ এবং বক্ষের মাঝেখানে তীর বিদ্ধ হয়েছিল, যা বিদ্ধ হয়ে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি শহীদ হন নি, এরপর সেই তীর বের করা হয়। এই তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে তার শরীরের বা'দিক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এটি প্রথম দিনের কথা, এরপর তাকে তুলে তার তাঁবুতে নিয়ে আসা হয়, যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপ নিতে থাকে আর মুসলমানরা পরাজিত হয়, এমনকি মুসলমানরা এক পর্যায়ে পিছু হটতে হটতে নিজেদের অবস্থানস্থল থেকেও পেছনে চলে যায়, তখন হযরত আবু আকীল আহত ছিলেন। তিনি হযরত মা'ন বিন আ'দীর আওয়াজ শুনতে পান যে, তিনি আনসারদেরকে গগণ বিদারী কণ্ঠে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন (আর বলছিলেন), আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করো, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা রাখো এবং তোমাদের শত্রুর ওপর পুনরায় আক্রমন করো। আর হযরত মা'ন মানুষের সম্মুখভাগে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এটি তখনকার কথা, যখন আনসাররা বলছিল যে, আমাদের অর্থাৎ আনসারদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে দাও। অতএব একজন একজন করে আনসার একপাশে সমবেত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করবে আর বীরত্বের সাথে সম্মুখে এগিয়ে যাবে এবং শত্রুর ওপর আক্রমন করবে আর এতে সব মুসলমানদের মাঝে দৃঢ়তা ফিরে আসবে আর মনোবল সুদৃঢ় হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন উমর বর্ণনা করেন, এরপর হযরত আবু আকীল আনসারীদের কাছে যাওয়ার জন্য দাঁড়ান। (যদিও তিনি) আহত অবস্থায় ছিলেন, চরম দুর্বলতাও ছিল কিন্তু (তা সত্ত্বেও) দাঁড়িয়ে যান। আমি বললাম, হে আবু আকীল! আপনি কি চান, যুদ্ধ করার মত শক্তি তো আপনার মাঝে নাই। (তখন) তিনি বলেন, এই আহ্বানকারী আমার নাম নিয়ে ডেকেছে। আমি বললাম, তিনি তো আনসারদের ডাকছেন, আহতদের নয়। তিনি তাদেরকে ডাকছেন, যারা যুদ্ধ করার সামর্থ্য এবং যোগ্যতা রাখে। হযরত আবু আকীল বলেন, তিনি আনসারদের ডেকেছেন, তাই আহত হলেও আমি যেহেতু আনসারদের অন্তর্ভুক্ত, তাই হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও আমি তার ডাকে অবশ্যই সাড়া দিব। হযরত ইবনে উমর বলেন, হযরত আবু আকীল তার কোমর বেঁধে নেন আর নিজের ডান হাতে উন্মুক্ত তরবারী ধারণ করে এই ঘোষণা দিতে আরম্ভ করেন, হে আনসার! হুনায়নের যুদ্ধের ন্যায় শত্রুর ওপর পুনরায় আক্রমন করো। তখন আনসাররা সমবেত হয়ে যায়, (আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি কৃপা করুন) এরপর মুসলমানরা একান্ত বীরত্বের সাথে শত্রুর দিকে এগিয়ে যায় এমনকি শত্রুকে রণক্ষেত্র ছেড়ে বাগানে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। মুসলমান এবং শত্রু পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর আমাদের ও তাদের মাঝে তরবারী আঘাত হানতে আরম্ভ করে। হযরত ইবনে উমর বলেন, আমি হযরত আবু আকীলকে দেখেছি, তার আহত হাত কাঁধ থেকে কেটে মাটিতে পড়ে ছিল, আর তার শরীরে চৌদ্দটি আঘাত ছিল, যার প্রতিটি আঘাত প্রাণহারী ছিল। আর আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা নিহত হয়েছিল, সেও সেখানেই পড়েছিল। হযরত আবু আকীল মাটিতে আহত (অবস্থায়) পড়েছিলেন, আর তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমি ঝুঁকে তাকে বলি, হে আবু আকীল! তিনি বলেন, লাব্বায়েক, আমি উপস্থিত আর প্রকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, কে বিজয় লাভ করেছে? আমি বললাম, আপনাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছি

যে, মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছে আর আমি গগণ বিদারী কণ্ঠে বলি আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা কায্‌যাব ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর তিনি খোদার প্রশংসার গান গাইতে গিয়ে আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলেন আর ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তার প্রতি প্রসন্ন হোন। হযরত ইবনে উমর বলেন, মদীনায় ফিরে আসার পর আমি হযরত উমর (রা.)-কে তার পুরো অবদানের কথা শোনালে হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'র প্রতি কৃপা করুন, তিনি সব সময় শাহাদতের প্রার্থনা করতেন আর আমি যতটুকু জানি, তিনি আমাদের মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম সাহাবীদের একজন ছিলেন আর প্রথম যুগেই (তিনি) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি হযরত উমর (রা.)'র উক্তি ছিল। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৪৯, বৈরুতের দ্বার এহ্‌ইয়াউত্ তারাসিল আরাবী হতে ১৯৯৬ সনে মুদ্রিত), (মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দেলভী রচিত হায়াতুস্ সাহাবাহ্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮০১-৮০৩, লাহোরের মকতুবাতুল ইলম থেকে মুদ্রিত)** আল্লাহ্ তা'লা সকল সাহাবীর পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হলো জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের মুরব্বী সিলসিলাহ্ শ্রদ্ধেয় মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের, যিনি ২০১৮ সনের ২৬ জুলাই ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনার সময়ই শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কাদিয়ান চলে যান। সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের সাহচর্যে তার বেড়ে ওঠার সৌভাগ্য হয়। ভারত বিভক্ত হবার পর বিদেশী ছাত্রদের স্ব-স্ব দেশে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন কিন্তু কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। (পুনরায়) বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে তিনি কোলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করেন, সফরকালে হিন্দু এবং শিখরা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, এক মুসলমান যুবক এমন বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে ট্রেনে কীভাবে একা নির্ভীকভাবে সফর করছে। যাহোক, দিল্লি পৌঁছার পর সেখানকার জামা'ত একটি ফ্লাইটে তাকে লাহোর পাঠানোর ব্যবস্থা করে, তখন পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান অবিভক্ত ছিল আর তিনি নিরাপদে রাবওয়ায় পৌঁছে যান। তিনি সেখানেই জামেয়ার ছয় বছরের শিক্ষার্জন করেন, এরপর তিনি জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীনের আরো তিন বছরের কোর্স শেষ করে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর পাঞ্জাব এবং পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল ডিগ্রীও অর্জন করেন। এরপর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের জামা'ত সমুন্দরীতে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ এবং ৬৪-তে পূর্ব পাকিস্তানে তার পদায়ন হয়, তিনি সেখানে বিভিন্ন জামা'তে কাজ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কুরআনের বাংলা অনুবাদের জন্য একটা বোর্ড গঠন করেন। তখন শ্রদ্ধেয় কাযী মোহাম্মদ নযীর সাহেবের সুপারিশে মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেবের নামও তাতে যোগ করা হয়। এতে মুজাফ্‌ফর উদ্দীন বাঙ্গালী সাহেব এবং মৌলভী মোহাম্মদ আমীর বাঙ্গালী সাহেবও তার সাথে কাজ করতেন আর অনুবাদের কাজের জন্য রাবওয়ায় অবস্থান করেন। এরপর আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের ঢাকায় স্থানান্তর এবং চৌধুরী মুজাফ্‌ফর উদ্দীন সাহেবের ইন্তেকালের পর এই কাজের জন্য ১৯৭৯ সনে তাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের ইন্তেকালের পর তিনি একাই এ কাজ করতে থাকেন, অবশেষে শতবর্ষ জুবিলীর বছর কুরআনের বাংলা অনুবাদ ছাপার কাজ সমাপ্ত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র মুরব্বী এবং মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। তা'লীম তরবীয়ত এবং তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন। বেশ

কয়েকবার বিরোধীদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের শিকার হন। আল্লাহ্‌র পথে বন্দি হওয়ার বা কারাবাসের সম্মানও তিনি লাভ করেন। ১৯৯২ সনে যখন ঢাকার বকশী বাজারস্থ জামা'তের কেন্দ্রে শত্রুরা আক্রমন করে তখন তিনি একান্ত বীরত্বের সাথে একাই প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, এর ফলে তার মাথাসহ সারা দেহে বেশ কয়েকটি আঘাত লাগে।
শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা, দুই পুত্র, বেশ কয়েকজন পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রী রেখে গেছেন। তার তিন কন্যা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, ছেলেদের একজন আমেরিকায় আর ছোট ছেলে হাবীবুল্লাহ সাদেক সাহেব যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন এবং এমটিএ'র বার্তা বিভাগে কাজ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো পাকিস্তানের নানকানা জেলার সাঈদওয়ালার অধিবাসী মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ সাহেব শহীদের। তার পিতার নাম হলো মুকার্‌রম বিশারাত আহমদ সাহেব। ২৯ আগস্ট নানকানা জেলায় মাগরিবের সময় তার দোকানে ডাকাতরা আক্রমন করে আর তাদের গুলিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, ছয় জন ডাকাত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মোটরসাইকেলে চেপে তার দোকানে আসে। তার জুয়েলারীর দোকান ছিল, দোকানে প্রবেশ করে এবং লুটপাট চালায় আর লুটপাট করার পর বাইরেও এলোপাথারি গুলি ছুড়তে থাকে, যার ফলে একজন পথচারীও মারা যায়। ডাকাতরা যখন লুটপাট করে ফিরে যাচ্ছিল তখন তারা জাফরুল্লাহ্ সাহেবকে লক্ষ্য করে তিনবার গুলি করে, যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন। জাফরুল্লাহ্ সাহেবের দোকানে তিনি ছাড়া আরো লোকজন ছিল কিন্তু তারা শুধু জাফরুল্লাহ্ সাহেবকে লক্ষ্য করেই গুলি করে অর্থাৎ এই লোক আহমদী, একে টার্গেট করো, কোনো অসুবিধা নেই, দ্বিগুণ পুণ্যের ভাগী হবে। মরহুম খুবই উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মিশুক এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন। এ কারণেই তার ইন্তেকালের পর বহু সংখ্যক মানুষ সমবেদনা জানাতে আসে, যাদের একটি বড় সংখ্যা অ-আহমদীদেরও ছিল। মরহুম খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা রাখতেন, প্রতিটি তাহরীকে লাব্বায়েক বলতেন, রীতিমত বাজামাত নামায পড়তেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। মরহুম সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ ছিলেন। মরহুম মৃত্যুর পূর্বে সাঈদওয়ালার সেক্রেটারী তা'লীম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। জাফরুল্লাহ্ সাহেবের বয়স ছিল ৩০ বছর। আড়াই বছর পূর্বে তিনি বিয়ে করেছিলেন, দেড় বছর বয়সী তার এক পুত্র সন্তান আছে, যার নাম স্নেহের মুহাম্মদ তালহা। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী, পুত্র, পিতা-মাতা ছাড়া এক ভাই এবং পাঁচ বোন রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ও মনোবল দিন আর তার পুণ্যকাজগুলোকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)